

৩০০ জনের জন্য এক কেজি ডাল

আহমেদ জাফর ও আসিফুর রহমান •

ছাত্রজীবনে ডালের বাটিতে ভুলে হাত ধোয়া কিংবা থালায় ময়লার পানি ফেলার অনেক গল্প চালু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ক্যানটিনগুলোতে ডালের অবস্থাও অনেকটা সে রকম। গামলা ভরা পানিতে হলুদ আর তেলের পাতলা স্তর দেখে বোঝার উপায় নেই, তা ডাল নাকি থালা-বাটি ধোয়া পানি।

প্রথম আলোর অনুসন্ধান দেখা গেছে, এক কেজি মসুর দিয়ে রান্না করা ডাল গড়ে ৩০০ জনকে খাওয়ানো হয়। শুধু ডাল নয়, হল ক্যানটিনের অন্য খাবারের অবস্থাও করুণ। মাছ বা মাংসের টুকরোগুলো ২০ থেকে ২৫ গ্রামের। তরকারির স্বাদ এমন যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনোরকম মুখে দিয়ে গিলে ফেলতে হয়। তার ওপর ক্যানটিনের স্যাঁতসেঁতে নোংরা পরিবেশ ক্ষণে ক্ষণে ঝাপটা দেয় নাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের ক্যানটিনে ৯ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে মোট ৯৩৬ জন



খেয়েছেন। ওই দিনের বাজারের তালিকায় দেখা যায়, সারা দিনের জন্য ডাল রান্না করা হয়েছে তিন কেজি। অর্থাৎ প্রতি কেজি ডাল খেতে হয়েছে ৩০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে।

একই দিন সূর্য সেন হল ক্যাফেটেরিয়ায় খেয়েছেন ১ হাজার ৩৮১ জন। ওই দিন ডাল রান্না হয়েছিল পাঁচ কেজি। অর্থাৎ, প্রতি কেজি ডাল খেয়েছেন ২৭৬ জন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একটি ছাত্রী হলসহ মোট সাতটি হলের বাজারের তালিকা সংগ্রহ করে দেখা গেছে, গড়ে প্রতিদিন এক কেজি ডাল খেয়েছেন ৩০০ জন।

বাজারের ওই তালিকাগুলো

বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাধারণত ক্যানটিনগুলোতে আমিষের উৎস হিসেবে গরু ও মুরগির মাংস, মাছ, উটকি, ডিম ও ডাল রান্না করা হয়ে থাকে। গড়ে ২০ কেজি সবজি রান্না হয় এক হাজার শিক্ষার্থীর জন্য।

বিভিন্ন ক্যানটিনের মালিক ও কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এক কেজি ওজনের একটি মুরগি কাটা-ছেঁড়ার পর পাওয়া যায় ৬৫০ গ্রাম মাংস। এটাকে ৩০ থেকে ৩৫ টুকরা করা হয়। একজন শিক্ষার্থীর জন্য এক টুকরা। যার ওজন ১৮ থেকে ২০ গ্রাম। এক কেজি গরুর মাংস ৪০ থেকে ৪৫ টুকরো করা হয়। একেকজনের ভাগে পড়ে ২২ থেকে ২৫ গ্রাম। মাছের টুকরার আকারও প্রায় একই রকম।

বারডেম হাসপাতালের পুষ্টি বিভাগের প্রধান আখতারুন নাহার প্রথম আলোকে বলেন, মাছ বা মাংসের একটি টুকরো মাপলেই কিন্তু কতটুকু আমিষ পাচ্ছে, তা বোঝা যাবে না। মাপতে হবে ওই টুকরোর

এরপর পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

৩০০ জনের জন্য এক কেজি ডাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাড় বা কাঁটা বাদ দিয়ে শাঁসটুকু। তিনি বলেন, ১৯-২৪ বছর বয়সী একজন ছাত্রকে দৈনিক ৬০ থেকে ৭০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবার খেতে হবে। তা না হলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমবে। কাজ করা ক্ষমতা পাবেন না, ফলে পড়ালেখায় মনোযোগী হতে পারবেন না।

১৭টি হলের ৫০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিবেদকদের কথা হয়। তাদের ৯০ শতাংশই প্রথম আলোর কাছে ক্যানটিনের খাবার নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বাকিরা বলেছেন, তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নাজমুল হোসেন বলেন, 'খাদ্যমানের কথা ভোজানি না। কিন্তু কী যে খাই, আসলে তা-ই তো বুঝি না। মাছ, মুরগি বা গরুর মাংস—সবকিছুর স্বাদই প্রায় একই রকম লাগে। মনে হয় সবকিছু একই খোলে চুবানো হয়।'

সরেজমিনে দেখা গেছে, ক্যানটিনগুলোর রান্না ও খাবার পরিবেশনের অবস্থা আরও খারাপ। সূর্য সেন হল, বঙ্গবন্ধু হল, জিয়া হল, জসীমউদ্দীন হল, জহুরুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের রান্নাঘরের এগজস্ট ফ্যান (ভেতরের বাতাস বাইরে বের করে দেওয়ার পাখা) প্রতিটি নষ্ট। রান্নাঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে আর চারপাশে ময়লা-আবর্জনা থাকে। খাবার ঘরগুলো নোংরা আর দুর্গন্ধযুক্ত। মাছি ভনভন করে। অপরিচ্ছন্ন থাকে টেবিল ও প্রেট।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'হলে খেতে গিয়ে প্রথমে যে শিক্ষাটি পেলাম তা হলো, খাবারের নোংরা প্রেট সব সময় লবণ দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিতে হবে। প্রেটের তেল চিটচিটে ভাব আর আগেরজনের খাবারের ক্ষুদ্রাংশ এতে চলে যায়। তা না হলে ওই প্রেটে



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর ক্যানটিনে ডালে পানির পরিমাণই বেশি। সম্প্রতি ফজলুল হক হলের ক্যানটিন থেকে তোলা ছবি • প্রথম আলো

খাওয়া সম্ভব না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্যানটিন পরিচালক বলেন, '১৯৭৮ সালের পর থেকে হল ক্যানটিনে ভর্তিক দেওয়া হচ্ছে না। ন্যূনতম লাভের পর সর্বোচ্চ ভালো জিনিসটাই আমরা দিতে চাই।'

গত পাঁচ বছরের বাজেট বই ঘেঁটে দেখা যায়, কেবল হল ক্যানটিনগুলোর তৈজসপত্র কেনা বাবদ প্রতিবছর ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও খাবারের ভর্তিকির জন্য কোনো বরাদ্দ নেই।

আরেকটি হলের ক্যানটিন পরিচালক দাবি করেন, 'প্রায় প্রতিদিনই গড়ে ৩৫-৪০ জনের বেশি ছাত্র ফাও খেয়ে (টাকা না দিয়ে খাওয়া) চলে যান। যদি এটা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারেন, তাহলে আমরা আরেকটা ভালো খাবার দিতে পারব।' ওই পরিচালক অভিযোগ করেন, মূলত সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একটা অংশ ফাও খায়।

কেবল 'ফাও খাওয়ার' কারণেই নিম্নমানের খাবার দিতে বাধ্য হচ্ছেন ক্যানটিন মালিকেরা, এটা মানতে নারাজ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদ আল হাসান। তিনি প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, 'আমরা কারও ফাও খাওয়ার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স অবলম্বন করছি। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, 'হলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ক্যানটিনের ম্যানেজারের সঙ্গে খাবারের মান ও স্বাদ বাড়ানোর বিষয়ে কথা হয়েছিল। তারা ফাও খাওয়ার বিষয়টিকে দায়ী করেছেন। আমি নিজেও কয়েক দিন নজরদারি করে এর সত্যতা পেয়েছি।'

খাবারের নিম্নমানের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. আম স আরোফিন সিদ্দিক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবারের মান বাড়ানো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে হলগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে।'